গল্পের পাতা ১ - " কাহিনির মতো "

প্রশান্তকুমার দাস
অনুবাদ - সুজিৎ দাস
০৫ জানুয়ারি ২০২১

প্রশান্ত কুমার দাস আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট গল্পকার।
আঙ্গিক ও বিষয়ের অভিনবত্ব তাঁর গল্পে প্রায়শ ই অন্য মাত্রা এনে দেয়।
আধুনিক অসমিয়া গদ্য সাহিত্যে স্বতন্ত্র এক গল্প-ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই গল্পকার অনন্য।
ইতিমধ্যে তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প সংকলন ও প্রকাশিত হয়েছে।
মূলত বরপেটা নিবাসী হলেও অসমিয়া দৈনিক পত্রিকায় কর্মসূত্রে বর্তমানে গুয়াহাটি নিবাসী।
এখানে অনূদিত 'কাহিনির মতো' ছোটগল্পটি ইমরান হুসেন সম্পাদিত
'রূপান্তরর গদ্য : স্বরাজোত্তর নির্বাচিত অসমিয়া গল্প (১৯৪৭---২০০৫)' ছোটগল্প সংকলন থেকে গৃহীত।

অসমিয়া থেকে ভাষান্তর সুজিৎ দাস ।

কৃতজ্ঞতা : লালন মঞ্চ, করিমগঞ্জ ...

স্বাধীনতার জন্য ওইপারের দেশটিতে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, খান বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ৷ বাবার কাছে শোনা ওইপারের দেশের সেই গল্প আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল আর সে জন্যই গল্পগুলো আরো বিস্তারিতভাবে বলার জন্য কিংবা আরেকবার নতুনভাবে বলার জন্য বাবাকে পাগল করে তুলেছিলাম৷ বাবার কাছে শোনা সেই দেশ ও স্বাধীনতার কথা শুনে শুনে আমিও যেন তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম৷ আর সেই প্রেম ছিল কোনো এক নিষিদ্ধ অনুভবের মতো৷

সীমান্ত থেমে মাত্র কয়েকক কিলোমিটার দূরে একটি উঁচু পাহাড়ের নীচেই ছিল আমাদের গ্রামটি৷ গ্রামটিতে যাওয়ার সময় একটি পথের সংযোগস্থলেই দরজির কাজ করে বাবা আমাদের প্রতিপালন করেছিলেন৷ সময় সুযোগ পেলেই বাবা আমাকে কাঁধে তুলে প্রায়ই পাহাড়ে উঠতেন৷ পাহাড়টির সবচাইতে উঁচু জায়গায় উঠে অনির্দিষ্ট কোনো একটি জায়গার দিকে আঙুল তুলে বাবা বলতেন–'দেখ, ওই জায়গাটাই ছিল আমাদের দেশ'৷

আমি বাবার কাছেই প্রথম শুনেছিলাম দেশের কথা৷ কিন্তু দেশ মানে কী, বাবাকে কোনোদিনই জিজ্ঞেস করিনি, বাবার কাঁধে উঠে দূর দিগন্তে তুলে ধরা আঙুলটির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করার সময়ে জিজ্ঞেস করতে পারি নি কী এই দেশ৷ আমি বেড়ে উঠছিলাম আর বাবার উপলব্ধির মধ্য দিয়েই আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম দেশের অস্তিত্ব৷ সেই সময় বুঝেছিলাম যে দেশ মানে দিগন্তে বিলীন হয়ে থাকা একটি নীলাভ সবুজ সমতল ভূমি, যাকে পাহাড়ের উঁচু জায়গা থেকে দেখা যায়৷

বাবার কাছে শোনা দেশের গল্পগুলো যেন কিংবদন্তি মনে হচ্ছিল৷ বাবা বলছিলেন–দেশে আমি ওটা করেছিলাম, আমি কখনো ওটা করিনি, দেশে এটা পাওয়া যায়, দেশে এটা ওর থেকে অনেক ভালো ছিল, সেটা তোমার আর কখনো বুঝবে না..৷ একদিন রাজে কাজ থেকে ফিরে এসে বাবার সেই কথাটি আমার আজো মনে আছে 'দেশে যুদ্ধ চলছে, খান সেনা আর থাকবে না৷ আমরা আমাদের দেশে ফিরা যাইতে পারুমা'

দেশে ফিরে যাওয়ার বিহ্বলতা বাবার মনে এতটাই তীব্র হয়ে পড়েছিল যে কোনো যুক্তি কারণ ছাড়াই তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধের পর আবার এক হয়ে যাবে দুই দেশ৷ সেইদিন পরম প্রত্যাশা ও উৎসাহে দেশের দিকে যাত্রা শুরু হবে, যেখানে তাঁর শৈশব-কৈশোর আর যৌবনের রঙিন স্মৃতিগুলো ফেলে এসেছিলেন৷ বাবা কেন এরকম ভেবেছিলেন আমি আজো সেটা বোঝার চেষ্টা করি৷ একজন সাধারণ দরজি হিসেবে আমার বাবা সেই সময়ে শোনা অজস্র খবর আর উড়ো খবরের ভিত্তিতে এরকম কল্পনা করে হয়তো আত্মতৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করেছিলেন৷ অথচ 'দেশে ফেরা'র এই অন্তহীন আশা বাবা শেষদিন পর্যন্ত মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন৷

গ্রীষ্মের এক দুপুরে, বাবার অনুপস্থিতিতে মাকে লুকিয়ে স্কুল থেকে পালিয়ে মেলা দেখতে যাওয়া অবাধ্য ছেলের মতো পাহাড়টি পেরিয়ে এমন একটি দেশের মাটিতে পা রেখেছিলাম যেখানটায় সত্যিসত্যিই কিছু একটা শুরু হয়েছিল, সেটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের মতো৷ মুক্তির অদম্য কল্পনার মধ্যেই যে মনের ভিতর কোনো এক দেশের অস্তিত্ব গড়ে ওঠে সেটা আমি বহুদিন পর আবিষ্কার করেছিলাম৷ কাজের খোঁজে সীমান্তের সেই ছোট্ট গ্রামটি ছেড়ে ঘটননাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে আমি স্বাধীনতাবোধের ইতিহাস বিশ্লেষণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম৷ একটা সময় যখন আমি একটি দৈনিক সংবাদপত্রে রাজনৈতিক নিবন্ধে লিখতে শুরু করেছিলাম তখন স্বাধীনতা চেতনার তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর সঙ্গেও আমার একটা পরিচয় গড়ে ওঠে৷ কিন্তু সেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলো আমাকে কোনোভাবেই বোঝাতে পারেনি–কেন দেশ ভাগ হয়ে যায়, কেন একটি দেশের ভিতর গড়ে ওঠে অন্য একটি দেশ, যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে মানুষের স্বাধীনতাবোধ৷ সেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলো অআামাকে বোঝাতে পারেনি– কাঁটাতার দিয়ে চিহ্নিত সীমারেখা পেরিয়ে গেলে কেন একটি দেশ শেষ হয়ে যায়৷ আর কেনই বা সীমান্তেই শেষ হয়ে যায় স্বাধীনতাবোধের ব্যাপ্তি৷

আমি দেখেছিলাম সীমান্তে ব্যগ্র ব্যাকুল মানুষের ভিয৷ সেখানে কিসের একটা গোপন প্রস্তুতি চলছিল, যেন সেটা ছিল কোনো নিষিদ্ধ প্রাপ্তির জায়গা৷ দিনরাত চলছিল অস্ত্র প্রশিক্ষণ আর যুদ্ধের প্রস্তুতি৷ এপারের সৈনিকরা হাতে বন্দুক নিয়ে লুঙ্গি পরে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল৷ আর সেইপারের মুক্তিকামী মানুষের সঙ্গে জনসমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল৷ তীব্র কৌতূহল নিয়ে আমি ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করেছিলাম আর লক্ষ্য ককরেছিলাম বিশাল জনসভায় ভাষণরত মুজিবুর রহমান, হাত উপরে তুলে শ্লোগান মুখরিত মানুষ, সারিবদ্ধ টেঙ্ক, আগুন, মৃতদেহ, শুকন ও রেডিওতে কান পেতে থাকা উৎসুক মানুষের ভিড় আর হাস্যোজ্জ্বল যুদ্ধফেরত মুক্তিসৈন্যদের স্পর্শ করার জন্য মানুষের প্রাণান্তকর চেষ্টা সেই দৃশ্য৷

এই একই ঘটনাই যেন বাবা আমাকে কৈশোরে কোনো এক কিংবদন্তি গল্পের মতো শুনিয়েছিলেন৷ কখনো কখনো এমনও মনে হয়েছিল ইতিহাসের বইয়ে দেখা ছবি আর অক্ষর দিয়ে বর্ণিত গল্পগুলোর সঙ্গে বাবার গল্পগুলো যেন একাকার হয়ে পড়েছে৷ আমার বাবার কাছে দেশে দু'বার করে স্বাধীনতা এসেছিল৷ একবার দেখা আরেকবার শোনার মধ্য দিয়ে তা এসেছিল৷ কিন্তু দুটি উপলব্ধির মধ্যেয ছিল বিশাল পার্থক্য কিন্তু উল্টোটা ছিল না, কারণ তার ভিত্তি ছিল সেই একটিই দেশ, যেখানে স্বাধীনতার জন্য মানুষ বহুদিন আগে একসঙ্গে লড়াই করেছিল৷

বাবার যখন ভরা যৌবন তখন ময়মনসিংহের লক্ষীনারায়ণ টেলারিংয়ে বারান্দায় বসে কাপড় সেলাই করছিলেন৷ সে সময় বাবা রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ শোভাযাত্রা যেতে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন সত্যাগ্রহ ও অনশন, দেখেছিলেন কাছারিতে জ্বলে ওঠা আগুনের লেলিহান শিখা 'নয় আগস্ট'-এর ঘটনায় বাবাও কাজকর্ম বন্ধ করে রাজপথের অন্তহীন মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন৷ তারপর সেই ভয়ংকর আকাল 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'৷ হাতে শূন্য থালা নিয়ে লঙ্গরখানায় ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার, মানুষের কংকালসার চেহারা আর শুধু মৃতদেহের পর মৃতদেহ৷ দুর্গন্ধ আর সারি সারি শকুন৷

অবশেষে এককদিন মধ্যরাতে বাবা দেখেছিলেন হঠাৎ দুম করে অন্ধকার নেমে এসেছে চারদিকে আর সহসা হাজার রঙিন আতসবাজিতে মায়াময় হয়ে উঠেছে রাত্রির আকাশ, দরজার খিল বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে উল্লসিত অসংখ্য মানুষ৷ অবাক বিস্মিত আর মোহমুগ্ধ আর বাবাকে কারা যেন বলে গেল–'আমরা অহন থেউক্যা স্বাধীন হৈলাম৷'

বাবাই বলেছিলেন এই গল্পগুলো৷ কিন্তু এই স্বাধীনতার মানে কী? স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে মানুষ আসলে কী খুঁজছিল? স্বাধীনতা মানে নিজের অধীন? কী সেই নিজ? যা স্বয়ং? নিজের অধীন হওয়ার মধ্য দিয়েই সেই অন্তহীন মুক্তি? অল্টিমেট ফ্রিডম? আমি ভাবি আর এমন মনে হয় যেন স্বাধীনতা মানে কিছু নেই, শুধুমাত্র একটি উপলব্ধি, যা গড়ে ওঠে স্বাধীনতাহীন অন্য এক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে৷ কে জানে–স্বাধীতা কী রকম৷ হয়তো বা তারচাইতেও ক্লান্তিকর, একঘেয়ে ও অসহ্য৷

তবু একটি নতুন দেশ কিংবা স্বাধীনতার উপলব্ধি কী যে অদ্ভুত মাদকতায় ভরা, পরবর্তীকালে সেটা আমি নিজেই অনুভব করতে পেরেছিলাম৷ কাজের খোঁজে মহানগরটিতে পাগলের মতো ঘুরতে ঘুরতে একদিন এসে উপস্থিত হয়েছিলাম একটি গোপন আস্তানায়৷ কারা যেন কানে কানে বলেছিল–'ওই, ওই আমাদের চারু মজুমদার৷' তারপরই আমি গোপনে যুদ্ধের পাঠ নিয়েছিলাম আর এগুলো করার মধ্য দিয়েই আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম অন্য এক দেশ, অন্য এক স্বাধীনতার৷ নেশার মতোই ছিল সেই উপলব্ধি৷ নদীর পিচ্ছিল শুকনো বালির মতোই ছিল সেই স্বাধীনতা, যেভাবে জোরে মুঠি চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, তা বেরিয়ে যায়৷ না পাওয়ার মধ্যেই প্রাপ্তির সেই গভীর উপলব্ধি৷

বেঙুনবাড়ীর মিটারগজ স্টেশনে সকাল সাতটায় ট্রেন ধরে আমার বাবা আমার কাজে যেতে শুরু করেছিলেন৷ কিন্তু চারদিকে একটা থমথমে ভাব৷ বাবার দোকানে নতুন জামা সেলাই করতে কারোরই কোনো উৎসাহ ছিল না৷ একদিন রাতে ট্রেন থেকে নেমে যখন খালি হাতে বাড়ি ফিরছিলেন তখন হঠাৎ একদল মানুষ বাবার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল৷ 'তুমারা এইহান থেইক্যা যাওন লাগবো, এইটা অহন তুমাগো দেশ না৷'

এই দেশ বলে 'জায়গা'টি সত্যিকার অর্থে কি যেন অদ্ভুত ছিল৷ মানুষ কেন মাটির ওপর চিহ্ন টেনে, সেই চিহ্নের ওপর কাঁটাতার দিয়ে সৃষ্টি করে এক একটি দেশ, মাইলের পর মাইল দীর্ঘ সীমান্ত সৃষ্টি করে, ভাবতে থাকে–এটা, এটাই আমার দেশ৷ জানার চেষ্টার মধ্যেই এগুলো আমার কাছে অরো বেশি দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে৷ বাবার মুখে শোনা গল্পগুলো ইতিহাসের বইয়ে অন্য মাত্রায় ভেসে উঠেছিল আমার কাছে–সীমান্ত পেরিয়ে আসা সেই ট্রেন, কামরার মধ্যে অসংখ্য মানুষ–যেন সেটা ছিল অনিশ্চিয়তার অবসানে অন্য এক অনিশ্চয়তার দিকে যাত্রা৷ বাবা বলেছিলেন–'আমরা তহন হুনছিলাম ওইপার থেইক্যা ট্রেন কইরা আইছিলো খালি লাশ আর লাশ৷'

অনেকদিন পর হিস্টরি চেনেলের 'দেশভাগ' নামের একটি ডকুমেন্টরিতে দেখেছিলাম কীভাবে আমার চেতনায় ধীরে ধীরে বাবার গল্পগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে৷ সাট করে একঝাঁক উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল আর ভেসে উঠল একটি ম্যাপ, যা ক্রমশ জুম ইন করে কাছে চলে এসেছে এবং ক্রমশ স্বেচ্ছ হয়ে উঠেছে একটি বিন্দু থেকে আঁকাবাঁকা পথের একটি রেখা, যা আবার সেই বিন্দুতে মিলিয়ে গেছে৷ আমার মনে হয়েছিল যেন ডকুমেন্টরির সেই গ্রাফিক্সের রঙিন রেখাটি যেভাবে মুহূর্তের মধ্যে দেশ নামের একটি ক্ষেত্রফল তৈরি করেছিল, তার চাইতে কোনোভাবেই পৃথক ছিল না লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে জন্ম নেওয়া সেই স্বাধীনতার জন্য একসঙ্গে যুদ্ধ করেছিল৷ তারপর একদিন হঠাৎ একটা অদৃশ্য চিহ্ন এঁকে দেওয়া হলো তাদের ফসল খেতের মধ্য দিয়ে, উঠোনের মধ্য দিয়ে, মাঠ ও আসা যাওয়ার পথের মধ্য দিয়ে৷ আর হঠাৎ দু'টুকরো হয়ে গেল তাদের দেশপ্রেম, স্বাধীনতাবোধ এমনকি জাতীয়তাবোধের সেই উঁচু সৌধটাও৷ সহসা মানুষ ভূতগ্রস্তের মতো ভাবতে শুরু করল 'ওই দেশটা আমাগো, এই দেশটা আমাগো না৷'

একদিন রাতে বাবা ক্লান্ত-বিষণ্ণ মনে কাজ থেকে ফিরছিলেন৷ ফেরার সময় কারা বাবার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল অন্ধকার থাকায় তিনি তাদের মুখগুলো চিনতে পারেননি৷ কিন্তু কে জানে স্বাধীনতার পূর্বে এদের কারোর জামা বাবা সেলাই করেছিলেন৷ সে জানে সেই জামাটি পরেই সে বাবাকে ইফতারের নিমন্ত্রণ দিতে এসেছিল৷

ইতিমধ্যে মহামারীর মতো চারদিকেই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল৷ পাড়ার পাড়ায় কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, দা দিয়ে পুরুষকে কেটেছিল, মেয়েদের ধর্ষন আর ছোট ছোট শিশুদের আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলছিল৷

সেই আতঙ্কগ্রস্ত ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পরিবারের অন্য একটি জীবন শুরু হয়েছিল৷ ঘরের চালের খড় সরিয়ে বাবা নতুন টিন লাগিয়েছিলেন৷ একদিন দিন-দুপুরে একদল মানুষ এলো আর সেই টিনগুলো খুলে গরুর গাড়িতে বোঝাই করে চলে গেল৷ সেদিন রাতে ঘরের ভিতর থেকে দেখা গেল অর্ধচন্দের উন্মুক্ত আকাশ৷ মা-বাবা একান্তে কাছে বসে যখন রাত জাগছিলেন, তখন হঠাৎ একদিন দরজার মধ্যে মধ্যে শব্দ হলো ‘দরজা খোল, এ িযে আমি৷’

‘কে আমি?’

‘আমি–তোমাগো দোস্ত৷’

বাবা দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং উর্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকে বাবার দোস্ত বলতে শুরু করলেন–‘জলদি কর, তোরা এইহান থেইকে পলাইয়া যাওন লাগবো অহান৷ ওরা আইতাছে৷’

বাবার বন্ধুর আনা একটি ঘোড়া গাড়িতে উঠে দুই বন্ধুর পাহারায় শেষ রাত্রির অন্ধকার পথে দিয়ে আমাদের পরিবারটি যাত্রা শুরু করেছিল–দেশ ছেড়ে অন্য এক দেশে সেই যাত্রা৷ গ্রেভেলিং করা একটি ছোট পথ দিয়ে সশব্দে গাড়িটি এগিয়ে যাচ্ছিল, কারো মুখে কোনো কথা ছিল না৷ অনেক দূর থেকে অজশ্র মানুষের চিৎকার কানে আসছিল আর হঠাৎ চোখে পড়েছিল দূরে ছেড়ে আসা দিক থেকে আগুনের শিখা৷ সেই আগুনে আমাদের গ্রামটি বা বাড়িটি পুড়েছিল কি না আমরা আজো জানতে পারিনি কিন্তু এর উত্তাপে বাবা-মমা’র হৃদয় পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম৷

বাবা বলতেন, আমাদের পরিবারটি ছিল খুব নিঃস্ব একটি পরিবার৷ আমাদের নিজস্ব কোনো জমি ছিল না৷ কায়স্ত একটি পরিবারের জমিতে, তাদের আশ্রয়েই আমরা ছিলাম৷ আমার কবিরাজ দাদু স্বভাব থেকে মুক্তি না পেলেও ‘ঠাকুরদা’ সম্বোধনটিই ছিল তাঁর একমাত্র আত্মতুষ্টি৷ পৈতৃক জীবিকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্জির কাজ করা আমার বাবাও এই ধরনের আত্মতুষ্টি থেকে মুক্ত ছিলেন না৷৷ তিনি প্রায়শই বলতেন–‘তোর মাকে সারা গ্রাম ‘ঠাকরাইন’ বইলা ডাকতো৷’

সকাল সাতটায় মিটার গজ ট্রেনে ময়সিঙ যাতায়াতকালীন বাবা স্বাধীনতার অনেক সংবাদ আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতেন৷ সেলাই মিশিনের ঘড় ঘড় শব্দের তালে তালে এক টুকরো কাপড় থেকে একটি নতুন জামা প্রস্তুত হওয়ার যে প্রক্রিয়া ঠিক সেই প্রক্রিয়ার মতোই যেন দেশের স্বাধীনতারও প্রস্তুতি চলেছিল৷ দোকানের বারান্দায় মেশিন চালিয়ে বাবা শুনেছিলেন–জিন্না সাহেব আসছেন, জওহরলাল নেহেরু আসছেন, আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে অড্ডারত মানুষগুলো নিজেদের মধ্যেই তর্কাতর্কি করেছিল–জওহরলাল না জহরলাল নেহরু না নেহেরু!

একদিদন লক্ষীনারায়ণের কর্মচারীরা দোকানের বারান্দা থেকে অবাক ও ভীতিগ্রস্ত চোখে দেখলো–ক্ষুব্ধ মানুষের একটি মিছিল, সবুজ পতাকা আর উচ্চকণ্ঠের শ্লোগান–‘লড়কে লেংগে পাকিস্তান৷’

পাহাড়ের একটি উঁচু জায়গায় উঠে আঙুন দিয়ে বাবা আমাকে সেই দিকটা দেখিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর নিজের দেশ ছিল বলে ভেবেছিলেন৷ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছিলাম দূর দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়া সেই নীলাভ সবুজ সমতলভূমি, সেটা ছিল ক্যামেরা ‘টিল্টডাউন’ করে নেওয়া একটি লেন্ডস্কেপের মতো৷

Krishan Kotha

বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম–'এইহান থেইক্যা তোমাগো দেশ কত দূর বাবা?'

'অনেক দুরা'

আমি আজো বুঝতে পারিনি–এই অনেক দূর মানে কত দূর? কতটুকু দুরত্ব পেরিয়ে এলে, একজন মানুষ দেশ থেকে 'অনেক দূরত্বে' অবস্থান করে? এই 'অনেক দূরত্ব'-র উপলব্ধির মধ্যেই কি প্রতিদিন বাবার মনে দেশের অস্তিত্ব তীব্রতর হয়ে উঠেছিল, যা ছিল দূরত্বহীনভাবে কাছের! বাবা ভেবেছিলেন–তিনি দেশহীন, এখন তাঁর আর কোনো দেশ নেই। এই অস্তিত্বহীনতার মধ্যেই কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাবার সেই দেশ? চেতনার মধ্যে বয়ে নিয়ে যাওয়া নিজের দেশের ভার বাবাকে এমনভাবে নুয়ে দিয়েছিল যে আশ্চর্যজনকভাবে সেই ভাবের অসহনীয়তা আমিও যেন নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলাম। পাহাড়টির উঁচু দিকটিতে উঠে দুই হাতে মুঠি চেপে ধরে বাইনোকুলারের মতো সেই হাতের মুঠির ফাঁক দিয়ে দেখেছিলাম বাবার দেশটাকে আর এই উঁচু অংশ বসে চোখের সামনে আঙুল দিয়ে মেপে দেখেছিলাম সেই দেশটার দূরত্ব, চার আঙুলের মাপ থেকে সেটা বেশি ছিল না।

আমার মনে হয়েছিল যে দেশটির দূরত্ব মাত্র চার আঙুলের আর চার আঙুলের এই ব্যবধানের ধারণআকে কেন্দ্র করে আমি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাকে অনুভব করতে শুরু করেছিলাম। কোনো এক অজানা অন্তহীন চূড়ান্ত মুক্তির আকাঙ্খায় একটি স্বাধীন দেশ খুঁজতে খুঁজতে আমি একটি মহানগরের বাসিন্দা হয়ে গেলাম। আমার ছেলেমেয়ে হলো, তারা স্কুল যেতে শুরু করলো, নাম লেখানো হলো সত্রীয় নৃত্যে কোনো একটি স্কুলে আর একদিন দেশের গৃহবিভাগ থেকে দেশত্যাগের একটি নোটিশ পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

আমি বিভিন্ন অফিসে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছিলাম। দৈনন্দিন হাজারো ব্যস্ততার মধ্যেও পিআরসি, রেশনকার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, টেলিফোন বিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটাধিকার লিস্ট–ঠিক এ ধরনের অনেক বিরক্তিকর কাজের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এরপরও আমি নিজেকে প্রমাণিত করতে পারিনি যে আমি এই জায়গারই, এই জায়গাটাই আমার দেশ কিংবরা এই সবকিছু নিয়েই আমি দেশটিকে ধারণ করে আছি।

বাবা আমাকে বলেছিলেন–গ্রীষ্মের এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে, হাতে ষাট টাকা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে মা'র সঙ্গে ট্রেনে উঠেছিলেন। শংকিত-দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যাত্রীতে সব কামরা ভরে উঠেছিল। দাঁড়ানোর জায়গা ছিল না, বসার জায়গাও ছিল না। একটি নতুন দেশের দিকে দুরদিগন্তে ট্রেনটি চলে না যাওয়া পযর্যন্ত বাবার বন্ধু স্টেশনে বসে রইলেন। কামরার মধ্যে ভিড়ে ঠাসা যাত্রীদের বুকের গভীর বোঝা বয়ে নিয়ে ট্রেনটি এগিয়ে যাচ্ছিল। বাইরে ভেসে উঠছিল ছেড়ে আসা দেশের ছবি–গ্রাম, মাঠ, নদী আর রেল লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রেনটির দিকে পাথর ছুঁড়ে মারছিল কিছু বিক্ষুব্ধ লোক।

মা কোনোদিনই এত দীর্ঘযাত্রার জন্য ট্রেনে উঠেন নি। মা ঠিক জানতেন না তিনি কোথায় যাচ্ছেন? কোথায় এই ইন্ডিয়া? ইন্ডিয়া কি অনেক দূর? আর এটাও জানা ছিল না ইন্ডিয়াতে কি আছে এই দেশ যাকে মা ছেড়ে আসছেন?

হুস শব্দে হঠাৎ ঘোর অন্ধকার হয়ে যায় ট্রেনটি। মা চমকে উঠে আমাকে জাপটে ধরেছিলেন ভ্রাণাবস্থায় আমি ছিলাম তখন গভীরতম এক অন্ধকারে। রাজমহল পাহাড়ের সুড়ঙ্গের ঘোর অন্ধকারের ভিতর হঠাৎ প্রবেশ করার সেই মহুহূর্তটির কথা মা আমাকে অনেকবার বলেছিলেন। মা'র মনে সেই গভীর অন্ধকারের অর্থ কী ছিল? মা কি ভেবেছিলেন অন্ধকার সবসময়ই কেন আলোর ঠিক উল্টো? দেশ ছেড়ে দেশের খোঁজে সেই যাত্রার সময়ে হঠাৎ নেমে আসা সেই অন্ধকার থেকে যেন বাবা ও মা কোনোদিনই বেরিয়ে আসতে পারেননি, যেটা আসলে আলোর উল্টোদিক ছিল না। সেটা ছিল আধারের মতো আলো, আলোর জন্য প্রোথিত অন্য এক আঁধার।

দুইদিন পর একটা স্টেশনে এসে শেষ হলো সেই ট্রেন যাত্রা। স্টেশনের মধ্যে হাজার হাজার তল্পিতল্পারমতো পড়েছিল ক্লান্ত ক্ষুধার্ত মানুষ। রেল লাইনের পাশ দিয়ে পরের দিন বাবা-মাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি শরণার্থী শিবিরে। কোনো 'নো মেনস ল্যান্ডে' ছিল সেই শিবিরটি। কিন্তু অনেক অনুসন্ধানের পরও আমি জানতে পারিনি সেই শিবিরটি আসলে কোথায় ছিল, সীমান্তের এপারে না ওপারে। এই দেশে না সেই দেশে? কোথায় ছিল সেই শিবিরটি, যেখানে কয়েকমাস পর আমার জন্ম হয়েছিল।

(C) Ishan Kotha